মনে পড়ে

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

[লেখিকা রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের সম্পাদিকা। বিদ্যাভবনের সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণামাতাজীর সঙ্গে সুদীর্ঘ তিপ্পান্ন বছর তিনি একত্রে থেকেছেন। এ-রচনাটি তাঁদের দিনযাপনের স্মৃতিকথা।—সঃ]

সেটা হয়তো ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি। শ্রীসারদা মঠে শিক্ষার্থীজীবন শেষ হতে চলেছে আমার, শুনছি নিবেদিতা স্কুলে যেতে হবে। একটু বড় দিদিরা বললেন, ''তোমার খুব সৌভাগ্য, ওখানে আছেন লক্ষ্মীদি।'' এর কিছুদিন আগে একদিন দেখি একটি নতুন মেয়ে এসেছে যোগদান করতে। পরনে দামি সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি। চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। মুখে সর্বদাই হাসি। শুনলাম, পড়াশোনায় খুব ভাল, দর্শনে গবেষণা করছে। পরমপূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা। বাড়ির অমতে চলে এসেছে, তাঁরা খুব সচেষ্ট ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নাম নন্দিতা। পরবর্তী কালে তিনিই হলেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণামাতাজী।

আমার সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। ওর আমার প্রতি অহেতুক ভালবাসা ছিল প্রথম থেকেই। এমন একটি ভাল মেয়ের প্রতি আমারও আকর্ষণ ছিল। সে থাকত দোতলার ছোটদের ঘরে। দেখতাম জপে খুব অনুরাগ। আর ছিল বইপড়ার অভ্যাস।

তখন মঠে মহালয়ার দিন সাউথ ইস্টার্ন রেলের অফিসার্স কলোনি থেকে কর্তাব্যক্তিদের স্ত্রী ও শিশুরা একটি বড় বাসে করে আসতেন। সকালে এসে মন্দিরে ভজন করতেন। মঠের বড় মাতাজীরা তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। ফলমিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হত। সংখ্যায় তাঁরা ত্রিশ-চল্লিশ জন আসতেন। ব্যবস্থাপক পূজনীয়া নিত্যপ্রাণাজী খুব ব্যস্ত। তাঁদের প্রসাদ দেওয়ার জন্য ঠোঙা সাজাতে হবে ফলমূল কেটে। আরও আনুষঙ্গিক কাজ ছিল। সমবয়সিদের বললাম, ''আচ্ছা, নতুন মেয়েটি কই? আমাদের সাহায্য করতে ডাকি তাকে।'' ছুটে ওপরে গিয়ে দেখি—তিনি আসন পেতে মন দিয়ে চণ্ডীপাঠ করছেন—স্নানাদি সারা। আমি ডাকি—''ওদিকে কত কাজ। এসো। এখন কি পাঠের সময়?'' নন্দিতা অবাক, একটু বিরক্ত। বলল, ''এমন দিনে চণ্ডীপাঠ করব না?'' আমার সঙ্গে অবশ্য তখনই এসে কাজে লাগল। ক্রমে বুঝতে

শিখেছিল যে, সাধুকে জপধ্যান, পাঠ নিজের অবসরে করতে হয়। সারাদিন মঠের তথা আশ্রমের কাজে যুক্ত থাকাই তপস্যা।

আমাদের মঠের প্রথম সহাধ্যক্ষা ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব—পরমপূজনীয়া দয়াপ্রাণামাতাজী—গৌরীদি। তখনও 'মাতাজী' প্রভৃতি বলে সম্বোধনের রেওয়াজ হয়নি। আমরা বড়দের দিদিই বলতাম। গৌরীদি মঠের অন্দরের উঠোনে গুল দিতে বসেছেন—ডাক দিয়েছেন ব্রহ্মচারিণীদের ওই কাজে যোগ দিতে। তখন অভাবের যুগ। গোশালার গোবর এনে কয়লার গুঁড়ো প্রভৃতি দিয়ে মেখে গোলগোল নাড়ু পাকাতে হত আমাদের। তাতে জ্বালানির সাশ্রয় হত। সময়টা হয়তো দুপুর দুটো। নন্দিতা সে সময় গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাজের কথা জেনেও সে গুল দিতে আসত না। নিজের গুরুদেবকে তার জপের আকর্ষণ ও কাজের প্রতি অনীহা জানিয়েছিল—''গুল দিতে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।'' মহারাজও সস্নেহে যথোচিত যুক্তি তাকে জানিয়েছিলেন। পরে আর কখনও তাকে এমন সব কাজে নারাজ দেখিনি।

সাবেকি সম্পন্ন জমিদারবাড়ির সন্তান হলেও নন্দিতা খুব নিরভিমান ও সরল ছিল। পঙ্গতে বসে যা পেত, তা খেতে সর্বদা সক্ষম হত না। তাই কয়েকটি খাবার সে পাতেই নিত না। নিত্যকার মুড়ির জায়গায় একদিন বিকেলে 'উপ্‌মা' হয়েছে। মঠে ওটা দামি খাবার। নন্দিতা খেতে বসেই বলে উঠল, ''ওমা, হালুয়াতে নুন কেন? একটুও ভাল হয়নি।'' হাসির রোল উঠল। কদিন পর গৌরীদি ডাকছেন—''নন্দিতা কোথায়? ডাকো ওকে। এক ভক্ত লুচি-আলুর দম এনেছেন।'' একটি নবাগত মেয়েকে উনি ডাকছেন! আমি অবাক! উনি কী করে যেন বুঝেছিলেন, ওটি ওর প্রিয় খাবার! শেষবয়সে প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা হাসপাতালে কঠিন অসুখের সঙ্গে যুঝছেন। দরদি ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''মা, কী খেতে ইচ্ছে করে?'' উত্তর এল সহাস্যে—''গরম গরম লুচি-আলুর দম।'' ডাক্তারবাবুও হাসলেন, বললেন, ''এখনই তো ওটা হবে না!''

মঠে ২৫ বৈশাখে মন্দিরে ভজনের পর একটি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বলতেন পরমপূজনীয়া মুক্তিপ্রাণামাতাজী (শ্রীসারদা মঠের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা)। মনে আছে নন্দিতা রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায়ের একটি গান গভীর ভক্তিভাবে গেয়েছিল।

আমাদের সময়টি ছিল মঠের স্বর্ণযুগ। তখন অধ্যক্ষা ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ও অন্তরঙ্গ সেবিকা পরমপূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজী। তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন—আকাশ-বাতাস যেমনই থাকুক। বিশেষ দিনে মঠের অনেকেই গঙ্গাস্নান করতেন। অধ্যক্ষা মাতাজীকে আমরা 'মা' বলতাম। একদিন মা গঙ্গায় নেমেছেন, সঙ্গে সেবিকা ও অন্য অনেকে। কোথা থেকে নন্দিতা এল ডুব দিতে—পরনে দামি তাঁতের কাপড়। এমনটি নবাগতাদের ক্ষেত্রে হয়েই থাকে—কারণ যোগদানের সময় নিয়ে-আসা নতুন কাপড়গুলিই শুধু তাদের থাকে। যাই হোক, সবাই হাঁ হাঁ করে বলছেন, ''তুমি কী গো? এমন শাড়ি পরে গঙ্গাস্নান! কাপড় তো লাল হয়ে যাবে—জরির দফা শেষ!'' মা বলছেন, ''ও কী বলছ! নন্দিতা তো ঠিকই করেছে। মা-গঙ্গায় ডুব দেবে—তা খারাপ কাপড় পরতে হবে কেন? ভাল কাপড় পরেই গঙ্গাস্নান করতে হয়।'' নন্দিতা খুব খুশি মায়ের সমর্থনে।

একদিন কাজের সময় নন্দিতার হাত মায়ের বাহুতে লেগে গেলে সে প্রণাম করে কাতর হয়ে ক্ষমা চায়। মা সাদরে বলেন, ''মায়ের গায়ে কি মেয়ের হাত লাগে না? তাতে কী হয়েছে? তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ?'' নন্দিতা এটি সারা জীবন মনে করত।

আমি নিবেদিতা স্কুলে চলে যাওয়ার আগে নন্দিতা আমায় কিছু বলতে বলে। বলেছিলাম, ''ঠাকুরকে ধরে থাকো। যদি কখনও অসুবিধায় পড়, সহ্য করবে। না পারলে একেবারে বড়দের কাউকে জানাবে। সমবয়সি বা অন্য কাউকে নয়।''

১৯৭০ সালে নন্দিতা, ১৯৭১ সালে আমি বিদ্যাভবনে আসি। ও তাই সারাজীবন আমাকে বলত, ''কৃষ্ণাদি, আমি কিন্তু সিনিয়র।'' আমিও বলতাম ''তাই তো।'' এ-পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা বিদ্যাভবনে ছিলাম। দীর্ঘকাল একসঙ্গে থেকেছি। কেউই কখনও অন্য কেন্দ্র বা তীর্থেও যাইনি। যদিও বিদ্যাভবনে কখনও এক ভবনে একসঙ্গে থাকা হয়নি। একদিন কী দরকারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তুমি কি নন্দিতা ভট্টাচার্য?'' চটে গিয়ে বলেছিল, ''আমি নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়—ঠাকুরের পদবি। চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য ঠিক বামুন নয়।'' খুব মজা লেগেছিল। সব মানুষের প্রতি ওর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ হতাম, কিন্তু এমন সব কথা বলে সে আনন্দ পেত।

এতদিনের মধ্যে আমাদের মতান্তর একটু-আধটু যে হত না তা নয়—কিন্তু মনান্তর হয়নি কখনও। তখন কলেজের সম্পাদিকা পূজনীয়া ঋতপ্রাণা-মাতাজী। সদ্য প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত পূজনীয়া অমলপ্রাণামাতাজী। কিছুদিন পরে ঋতপ্রাণাজী মঠে চলে গেলে অমলপ্রাণাজী একাই কলেজ ও আশ্রম দুটিরই অধ্যক্ষা হন। তাঁর গুণ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম মঠের গৌরবময় পর্ব রচনা করেছে। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আমরা ছয়-আট জন ব্রহ্মচারিণী সব কাজে লাগতাম। সুমিত্রা—বেদান্তপ্রাণা, ললিতা—প্রজ্ঞাপ্রাণা, কমল—সচ্চিৎপ্রাণা, ইলা—অচিন্ত্যপ্রাণা, মঞ্জুলা—বিজ্ঞানপ্রাণা, নন্দিতা—ভাস্বরপ্রাণা, কৃষ্ণা—প্রদীপ্তপ্রাণা। সকলেই সমকালে যে থেকেছি এমন নয়। কিন্তু এখানে শেকড় গজিয়েছে কেবল শেষ দুজনের।

ভাস্বরপ্রাণা চায়ের খুব ভক্ত। কোনও সংকটে পড়েছি, সে বলে ''শিগগির চা করো।'' কোনও সংকট মোচন বা আনন্দের ঘটনা ঘটলেও বলে ''শিগগির চা দাও—উৎসব করি।'' আমি চা ভালবাসি না একেবারে। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করত, ''আমার গুরুদেব [স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী] আর আমি চা খাই। জানো, চা না খেলে লোকের মাথা খোলে না।'' আমি বলতাম, ''আমার গুরুদেব [স্বামী মাধবানন্দজী] চা খেতেন না, আমিও খাই না। তবুও তিনি তো ছিলেন মেধায় বেলুড় মঠের মুকুটমণি। তাহলে আমারও ছোট্ট প্রাণ ঠিক চলে যাবে।'' তখন খুব হাসত।

কখনও ভাস্বরপ্রাণা আমায় বলত, ''জানো আমার সিংহরাশি!'' বলতাম, ''বুঝতেই পারছি—তোমার যে-হাঁকডাক, হুম্‌হাম্‌!'' শ্রীশ্রীমায়েরও সিংহরাশি। এদিকে আমার কুম্ভরাশি—ঠাকুরেরও তাই। কখনও যদি তুই বলে ডেকে ফেলেছি—খুব গম্ভীরভাবে বলত, ''আমাকে 'তুই' বলবে না।'' ''বেশ বলব না!'' কিন্তু কেন তা জানি না। আমি বয়সে বড়—সঙ্ঘজীবনেও বড়। কিন্তু অদ্ভুত যে, সে আমাকে স্নেহের বালিকা মনে করত সারাজীবন। আবার শুভ তিথিতে সারাদিন ভুলে থাকলেও

অন্তত রাতে শুতে যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে পাঠাত, উঁচুতে বসতে বলত।—কী ব্যাপার, না, তিনি পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করবেন! তাঁর সবই জোর খাটিয়ে।

বিদ্যাভবনে ব্রহ্মচারিণী নন্দিতা ছোট থেকেই প্রয়োজনীয় মানুষ। একবার একসঙ্গে পাঁচজন সদস্যা (অধ্যক্ষা ও অধ্যাপিকা) বিদ্যাভবন ছেড়ে চলে যান। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ছেড়ে গেলেন তাঁরা। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়ে গিয়েও কলেজ তার সব কার্যকলাপ ও মর্যাদা বজায় রাখতে পেরেছিল। অন্য বিষয়গুলিতে যোগ্য অধ্যাপিকা পাওয়া গেল। লজিক কে পড়াবে? নন্দিতা সে-বিষয়ে খুবই ভাল ছাত্রী ছিল। শেষ পর্যন্ত সে-ই কাণ্ডারি ছিল হসপার্স, কোপি পড়াতে। বোর্ড ওয়ার্ক করত অনায়াস দক্ষতায়। ছাত্রীরা খুব ভালভাবে পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করত ওর অধ্যাপনায়। ভয়ে ও ভালবাসায় তারা ওকে আপনার জন জানত। কেবল দর্শন নয়, সাহিত্যেও ভাস্বরপ্রাণার আন্তরিক অনুরাগ। বাংলা ও ইংরেজি লেখা ও বলায় তার সদাপ্রস্তুত ভাবখানি মুগ্ধ করত আমাকে।

ব্রহ্মচারিণী নন্দিতা রোজ কলেজের পর কিছু খেয়েই হেঁটে হেঁটে নানা জায়গায় যেত কলেজের জন্য অর্থসংগ্রহে। স্বভাবে সে খুব অভিজাত। কিন্তু ঠাকুরের কাজ মনে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত পাততে পারত। সেটা সত্তরের দশক। আমাদের আশ্রমের জমি অনেকটা। এটি ছিল এক পুণ্যব্রত ধনীর বাসগৃহ যুক্ত ছত্রিশ বিঘে বাগান। সেখানে মহিলা কলেজ হোক, স্বামীজীর আদর্শে—এই ছিল দাতার প্রস্তাব। বেলুড় মঠের পূজ্যপাদ মহারাজগণই রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ১৯৬১ সালে। যখন কলেজের বয়স দশ বছর, তখন থেকে এ-পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সাক্ষীদের অন্যতম ভাস্বরপ্রাণা ও আমি। পূজনীয়া অমলপ্রাণামাতাজীর অবদানের কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করে চলে আসছি পূর্বপ্রসঙ্গে। পূর্বোক্ত দাতার জমিদারি প্রাপ্ত হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু ছিল না বারোমাসের ছত্রিশ রকমের প্রয়োজন মেটানোর মতো তহবিল। তাই ব্রহ্মচারিণী নন্দিতার ওই প্রচেষ্টা। একজন বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু আমাদের জানাতেন, দমদমের কোথায় কোন মুক্তহস্ত ধনী ব্যক্তি আছেন। নন্দিতা যথেষ্ট বুদ্ধি, সৌজন্য ও সাহস রাখত অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে। আমি অমলপ্রাণামাতাজীকে বলেছিলাম যে আমি একাজে ভীত-সংকুচিত। শুনে মাতাজী হাসতেন। নন্দিতা হাসিমুখে চলে যেত—বিশ্রামরত বৃদ্ধা, বিরক্তমনের ব্যবসায়ী, আবেগপ্রবণ ভক্ত—সকলের কাছে। কিছু না কিছু আনতই। তখন সন্ন্যাসী না হয়েও ওর উদ্যম, তেজ ও নিঃস্বার্থ ভিক্ষাবৃত্তি দেখে আনন্দ পেতাম। আমাকে একদিন সঙ্গে নিল—উঠল গিয়ে একজনের দোতলার এক ঘরে। সেখানে কেউ জামাকাপড় বদলাচ্ছেন—বসার ঘর-টর কিছুই নেই। আমার খুব লজ্জা হল। ফিরে এসে ওকে বললাম, ''আমি আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না জেনে রেখো।''

তখনকার দিনে আশ্রমের পাঁচিল প্রায় ছিলই না। কাঁটাতার, কাচের টুকরো আদৌ মান্য না করে পাড়ার যুবক-বালকেরা আশ্রমের নারকেল, কলা, বাতাবিলেবু, ফুলকপি বা যখন যা পেত পাঁচিল পেরিয়ে এসে বস্তাভরে নিয়ে যেত প্রকাশ্য দিবালোকে। আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলতাম, ''কী করছ? এমন কোরো না।'' ওরা বলত, ''দিদিমণি, তোমাদের ঘণ্টা পড়েছে খেতে যাও। আমরা এগুলো নেব—এসব আমাদেরই তো!''

একবার সরস্বতীপুজোয় পাড়ার ছেলেরা প্যাণ্ডেল সাজাতে তুলে নিয়ে গেল আমাদের বেশ কিছু ফুলের টব। পুজোর পরদিন অমলপ্রাণামাতাজী বললেন, ''দেখো তো কী কাণ্ড! কী করা যায়!''

আমি তো যাব না, কারণ প্রমাণ কী দেব যে টবগুলো আমাদেরই! ওতে তো আর কলেজের নাম লেখা নেই! ভাস্বরপ্রাণা তো রানি ভবানীদের গোত্রের! চলে গেল আমাদের দুটি ছেলেকে নিয়ে। ওখানে গিয়ে হাঁক দিল—''বাহাদুর, এই টবগুলো নিয়ে যাও আমাদের বাগানে।'' দুষ্টু ছেলেরা হাঁ। বিনা প্রতিবাদে টবেরা যথাস্থানে এল।

আমরা কয়েকজন তখন মঠে যোগ দিয়েছি—জগৎজীবনের কিছুই প্রায় না জেনে। মা-বাবার পরম স্নেহে-যত্নে পরিপালিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা একুশ-বাইশ বছরের কয়েকটি মেয়ে। নন্দিতার রান্নার হাত খুব ভাল। কবে কোথায় শিখল জানি না। আসলে ও ভালবাসত খেতে ও খাওয়াতে। তাই নিজের শখে শিখেছিল হয়তো। মঠে এসে সে পেয়েছিল অনেক রন্ধনপটিয়সী মাতাজীদের সান্নিধ্য ও শিক্ষা। আমি প্রায় কিছুই রাঁধতে জানি না। শ্রীসারদা মঠের সহাধ্যক্ষা পূজনীয়া সাধনপ্রাণামাতাজী একদিন আমাকে সামাল দেওয়ার জন্য অনেকের সামনে বললেন, ''শোনো, কৃষ্ণা রান্না জানে না ঠিকই, কিন্তু ওর মার কাছে ও অনেক ভাল ভাল রান্না খেয়ে এসেছে।'' এতে হাসির বন্যা বয়ে গেল। ভাস্বরপ্রাণা রান্নাবান্নায় নিজের সবচেয়ে বড় শিক্ষক বলে জানত প্রয়াত পূজনীয়া বিমুক্তপ্রাণামাতাজীকে। তিনি বহুগুণে গুণী ছিলেন। তিনি বিদ্যাভবনে প্রথম থেকে বহুদিন বাস করে এই আশ্রমের শক্তি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, অতন্দ্র ধ্যানজপ ও অবিরাম কর্মপরায়ণতায় পূর্ণ নিরপেক্ষ এই মাতাজী আমাদের বিস্ময় জাগাতেন। তাঁর কাছে ভাস্বরপ্রাণা শৌখিন বা দৈনন্দিন খাদ্য তৈরির তালিম নিয়েছিল সাগ্রহে। বিমুক্তপ্রাণাজী খাবারের মাপজোক জানতেন আশ্চর্যরকম। ভাস্বরপ্রাণাও সহাস্যে বলত, ''আমি বাণীদির, বিমুক্তপ্রাণাজীর কাছে রান্না শিখেছি। ছটি চপ চাইলে ছটিই পাবে—সাতটি হবেই না।'' বিরাট ভোগের রান্নায় নুন-মিষ্টিও ভাস্বরপ্রাণা সঠিক বলে দিত। বিরাটের খিচুড়ি, তরকারি, চাটনির জন্য উপকরণের মাপ, আবার সুস্বাদু করার জন্য নানা কায়দা জানত। শেষের দিকে সে রান্নাঘরে যেতে পারে না বলে রাঁধুনি হাতায় বা ছোট প্লেটে খাবার এনে তাকে দিয়ে স্বাদ ঠিক করাত। আমি বলতাম, ''শুনেছি tea-tester-এর পদের অনেক অনেক বেতন। তোমারও তেমনই খুব দাম—উৎসবের রান্নায়।''

বিদ্যাভবনের বাগানে নানা শাকসবজি হয়। অতিথি এলে তাঁদেরকে এঁচোড়, কপি, ঢ্যাঁড়শ, লাউ, কাঁচকলা উপহার দেওয়া হয় কখনও কখনও। এবার, ভাস্বরপ্রাণার খুব ঝোঁক ছিল এসব প্রাপককে রান্নার পদ্ধতি বলে দেওয়ার। ধোঁকা, শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি—মুখে মুখে শেখাত। আমি বলতাম, ''আচ্ছা, ওর কি নিজের ইচ্ছেমতো রাঁধবার স্বাধীনতা নেই?'' সে বলত, ''আজকালকার মেয়ে—কী বা খেয়েছে—কতই রেঁধেছে এসব! তাই বলে দিই—নইলে নষ্ট হবে যে!''

আহার, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে ভাস্বরপ্রাণার অনেক কিছু জানা ছিল। আমরা দুজনে সারাজীবন আবাসিক ও ডে স্টুডেন্টদের দেখাশোনা করেছি—সেই যোগদানের সময় থেকেই। কার সত্যি অসুখ, কে পড়ার ভয়ে বা বাড়ি যাওয়ার জন্য অসুস্থতার ভান করছে তা ভাস্বরপ্রাণা বেশ বুঝত। কোনও ছাত্রী বেশি অসুস্থ হলে সে অনায়াসে তাকে পাঁজাকোলা করে স্থানান্তরে এনে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। একটি নতুন আবাসিক ছাত্রী একদিন ঠাকুরঘরের দ্বারের কাছে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ভাস্বরপ্রাণা তৎক্ষণাৎ ওকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। দুদিন পরে খবর এল মেয়েটি আর নেই—ব্রেনে কিছু হয়েছিল। একটি তাজা প্রাণ চলে গেল! কিন্তু চিকিৎসায় দেরি হয়নি, আশ্রমে কিছু ঘটেনি—এটি মায়ের অশেষ কৃপা। কর্মী, ছাত্রী,

সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী যে-কেউ অসুস্থ হলে ভাস্বরপ্রাণার দেওয়া ওষুধ-পথ্যই সে পাবে। একজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ যুবক পেট খারাপ হলেও স্বাভাবিক আহার্য নিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলত, ''ওরে বাবা, নন্দিতা মাকে আমি কিচ্ছুটি জানাব না। আমায় না খাইয়ে রেখে দেবে।''

ভাস্বরপ্রাণার নানা টোটকা জানা ছিল। যেমন—খুব সর্দি ইত্যাদি হলে ঠাণ্ডা-গরম মেশানো জল মগে করে উঁচু করে ধরে ঠিক মাথার মাঝখানে ঢালতে হয়, তাহলে সেরে যায়। আমিও এমন করে উপকার পেয়েছি। গরমের জ্বর হলে বারবার স্নান, মাথা ধোয়া চাই। এসব আমরা একটু একটু জানলেও ওর মতো ডাক্তারি করতে সাহস পেতাম না। বিদ্যাভবন মফঃস্বল শহরে। প্রয়োজনে ডাক্তার পাওয়া কঠিন ছিল অনেকদিনই। থার্মোমিটার বাদে আর কোনও সরঞ্জাম ছিল না। সেযুগে আমাদের পথ ছিল একমাত্র শরণাগতি ও প্রার্থনা। আর ভাস্বরপ্রাণার ছিল দেহেমনে অনেক শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস। ফোন নেই, যানবাহন নেই—তবু আমরা সভয়ে-নির্ভয়ে পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর পার হয়ে এসেছি এই কলেজ ও হস্টেলের মেয়েদের নিয়ে।

প্রসঙ্গত বলি, বিদ্যাভবনের প্রথম পর্বে পূজনীয়া অমলপ্রাণামাতাজীর ত্যাগ-তপস্যা ও প্রার্থনাই ছিল আমাদের এগিয়ে চলার অবলম্বন। তিনি যদি বলতেন, ''ভেবো না, ও (কোনও ছাত্রী) ভাল হয়ে যাবে'', তবে আমরা আর ভয় পেতাম না। সত্যিই ডাক্তার-বদ্যি-স্ট্রেচার ছাড়াই বিপদ কেটে যেত।

পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের আবাসিক স্কুল-কলেজ এবং হাসপাতাল প্রভৃতি কেন্দ্রে তাদের কাজের পরিমাণ ও কর্মিসংখ্যা অনুযায়ী কিছু দান করেছিলেন। আমাদের কলেজ পেয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা। পূজনীয় মহারাজ তাঁর প্রদত্ত টাকা ভাল খাওয়ায় ব্যয় করতে নির্দেশ দেন। শুনেছি মহারাজের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও শাখার প্রধান আবদার করেন—''ওরাই সব পেল, আমরা পাব না?'' মহারাজ বলেছিলেন, ''আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় রাখার দায়িত্ব ও পরিশ্রম, কর্মীদের কঠোর জীবন জান তো? তাই ওদের টাকা দিয়ে গেলাম।'' তিনি হয়তো সেবাপ্রতিষ্ঠান, নরেন্দ্রপুর প্রভৃতির কথা বেশি ভাবতেন। পরে আমি গিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলাম, তাঁর দানে সবাই কী কী ভাল জিনিস খেয়েছে। তিনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে পূজনীয়া অমলপ্রাণামাতাজী মঠে চলে গেলেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা হয়ে। ভাস্বরপ্রাণা ও আমি গেছি যোগোদ্যানে। পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীকে প্রণাম করে জানালাম, ''মহারাজ, আমাদের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ—আপনি আশীর্বাদ করুন। ঠাকুরকে একটু বলুন। আমরা কিছুই তো জানি না। আমাদের যেন ঠাকুর দেখেন।'' মহারাজ সহাস্যে বললেন, ''ঠাকুরকে বলে কিছুই হবে না। ওঁর তো কাপড়েরই ঠিক নেই। বরং সব উলটোপালটা হয়ে যাবে। তোমরা শ্রীশ্রীমাকে ধরো। তিনি যে বলেছেন, 'মা বলে কেউ এলে আমি তাকে ফেরাতে পারব না।' তাই তোমরা মাকেই ডাকো। তিনি ঠিক দয়া করবেন।'' আমরাও সকৌতুকে উল্লিখিত ওই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করতে চেষ্টা করেছি গত চব্বিশ বছর। ভাস্বরপ্রাণা এই ঘটনাটি অনেককে বলত, আর ঠাকুরের সম্বন্ধে মহারাজের মন্তব্যটি বলে হা হা করে হাসত।

ছাত্রীদের সঙ্গে ভাস্বরপ্রাণার সম্বন্ধ ছিল বড় মজার। একটি নেপালি বালিকা এখানে পড়তে এসেছিল। বাবা-মা দার্জিলিং-এ। দাদা নরেন্দ্রপুরের ছাত্র। সেই কিশোরই মেয়েটির স্থানীয় অভিভাবক। ওদের মা-বাবা দুজনকে দুই আশ্রমে রেখে নিশ্চিন্তে থাকতেন। মেয়েটির স্বভাব খুব ভাল।

আমরাই তার আপনার জন। একবার তার প্রবল অসুখ করে—টাইফয়েড। আমাদেরই কাছে রইল। এখানেই তার সেবা-চিকিৎসা হয়। খবর পেয়ে তার বাবা-মা যতদিনে এলেন সে তখন সুস্থ। বুদ্ধিমতী হলেও তার পড়ায় উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই। অনেক বকে, অনেক ভালবেসে তাকে বি এ পাশ করাতে হল। তাকে ভাস্বরপ্রাণা বলল, ''শোন, এই তো পড়া শেষ! তোর বুদ্ধি আছে, ভাল কাজ একটা পেয়ে যাবি। কিন্তু বিয়ে করবি না বুঝলি? একটা ফ্ল্যাট কিনে একা থাকবি। কাজ সেরে এসে সন্ধে থেকে খাটে শুয়ে টিভি দেখবি। ঠিক আছে?''

অতিথি-অভ্যাগতেরা আমাদের আশ্রমকে খুব ভালবাসেন। এখানকার প্রার্থনাগৃহ, প্রাকৃতিক শোভা সবারই মন কেড়ে নেয়। কিন্তু বাড়ি-বাগানই তো সব নয়, অধিবাসীরাই আশ্রমের প্রাণ। ভাস্বরপ্রাণা অধ্যক্ষা হিসাবে এবং মাতাজী হিসাবেও খুব সার্থক ছিলেন। পরকে আপন করার শক্তি ছিল তাঁর অফুরন্ত। ভক্তদেরও ছিল তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। সবার প্রতি তাঁর স্নেহযত্ন ও কল্যাণেচ্ছা প্রবাহিত হত। যে যার সুখ, দুঃখ, সমস্যা ও আনন্দ-সংবাদ তাঁকে জানিয়ে পেত আশ্বাস, সমাধান, শান্তি ও আনন্দ। পীড়িত, বিপর্যস্ত, দুর্বলের জন্য অবিচারে তাঁর প্রাণ কাঁদত। কত দরিদ্র মানুষকে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। তিনি সারাদিন অফিসের কাজের পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শুতেন, সে-সময় জনৈক শোকার্ত জননী তাঁর কাছে এসে বসতেন দীর্ঘ সময়। কথা বলে, একটু চা খাইয়ে, প্রসাদ দিয়ে তাঁকে বিদায় দিতেন। দিনের পর দিন শুধু নয়—বছরের পর বছর এমন ঘটেছে। ক্লান্তিতে শুয়ে থাকলেও কোনওদিন তাঁকে ঘুমোতে দেখিনি, খুব সজাগ থাকতেন—ওইভাবেই ফোনে ফোনে সমস্ত কাজ সারতেন, কত মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। শোকতাপ নিয়ে মা-বোনেরা অনেকে আসতেন তাঁর কাছে। তিনি তাঁদের শান্তি দিতেন। সন্তান-লাভেচ্ছু তরুণীদেরও ভরসা ছিলেন তিনি। তাঁর প্রার্থনার ফলে জাত তিন-চারটি শিশু ও তাদের মায়েদের জানি। শেষ কয়েকমাসও এ-বিষয়ে তাঁকে একজনের জন্য চিন্তিত দেখেছি। মজা করে বলেছি, ''দিয়ে দাও না একটি পুত্রবর? তুমি তো পার!'' হেসে বলেছেন, ''প্রার্থনা তো আমায় করতেই হবে! জানিয়েছে যখন আমাকে।''

ভক্তিভাব তাঁর খুব ছিল। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনের কাপড় ছোট হওয়ায় কেউ জোড়া দিয়ে তা তৈরি করলেন। ভাস্বরপ্রাণা তাতে খুবই রুষ্ট হন। বলেন, ''জোড়ের সেলাইয়ের ওপর কেউ বসতে পারে? ঠাকুর বসবেন ভাবলে এমন করা যায় না।'' ঠাকুরের ফল কাটবার সময় বলতেন, সেগুলি খুব বড় বা ছোট টুকরো করতে নেই। ঋতু অনুসারে ঠাকুরের জন্য ফল না আনা হলে দুঃখ পেতেন। ঠাকুরের খাবার তিনি নিজের হাতে বরাবর তৈরি করেছেন। শেষে ছোট মাতাজীদের হাতে ধরে মাপ বলে দিয়ে স্বাদুতার শর্তগুলি জেনে নিতে বলতেন। মোটকথা ঠাকুরের উপস্থিতি ঠাকুরঘরে ও সর্বত্র তিনি সতত অনুভব করতেন। তাই ঠাকুরঘরে কোনও গোলমাল, কথাবার্তা হতে পারত না। ঠাকুরের প্রসাদ নবাগত কেউ যদি পা-রাখা জায়গায় ভুল করে নামিয়ে ফেলত, তাহলে গর্জে উঠতেন।

বৈশাখ মাসে আমাদের শাখাকেন্দ্রগুলিতে কোথাও কোথাও নিত্য শিবপূজা করা হয়। ভাস্বরপ্রাণাও এইসময় নিত্য শিবপূজা করতেন অতিযত্নে। সবার জন্য এত চন্দন ঘষে রাখা সম্ভব হত না, কাশীর গোলাচন্দন দেওয়া হত। ওঁর দাবি, এক ফোঁটা হলেও ঠিক চন্দন দিতে হবে। এই বৈশাখে তিনি আর পুজো করতে পারেননি, খুবই অসুস্থ ছিলেন। ১৪৩১, বৈশাখ-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণে, শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, মঙ্গলবার, দিবাভাগে, অমৃতযোগে ভাস্বরপ্রাণা শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর পাদপদ্মে লীন হলেন।